ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1266-1271
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.129

ঔপনিবেশিক আমলে মেদিনীপুর জেলার ক্যানেল ব্যবস্থা ও তার প্রভাব

রাজীব বেরা, *সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, রবীন্দ্র ভারতী মহাবিদ্যালয়, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পি এইচ ডি গবেষক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.04.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

Medinipur is the second largest and second populated District of Bengal and has been an agricultural District since ancient times. The population of this District is more dependent on agriculture than other districts of Bengal. The fertile land, natural and geographical environment and rivers of the district are particularly very helpful to agricultural work. In spite of this multiple canal systems were built for agricultural purposes in this District. Some important canals are the Medinipur Canal, Hijli Tidal Canal and the Orissa Coastal Canal. In 1886, the East Indian Irrigation Canal Company began boring process of the Medinipur Canal and in 1871-72 the first irrigation started through this Canal, the quantity of irrigation was 6029 acres. Excavation of the Hijli Tidal Canal began in 1868 and the Orissa Coastal Canal in 1880. Since then, the quantity of irrigation has continuously increased in this district. In 1925-26, 75698 acres of land was irrigated and the profit was 182044 Rs. In 1939-40, 64882 acres of land was also irrigated. Moreover, through various branches of these Canals irrigation was possible in a wide area of this District. Therefore, the subject of this article is how the Canal system in Medinipur District expanded the agricultural system and improved the transportation system in this District.

Keywords: Agricultural, Fertile, Natural, Geographical, Environment, Irrigation, Excavation

মেদিনীপুর, বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও দ্বিতীয় জনবহুল এবং অতি প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি নির্ভর এক জেলা। বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির থেকে এই জেলার জনসমাজ মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। সামগ্রিক ভাগে বাংলার জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ জনগণ কৃষি কাজে যুক্ত, সেখানে এই জেলার ৭৬ শতাংশ জনগণ কৃষি কার্যের ওপর নির্ভরশীল।[১] মেদিনীপুর জেলার চেহারা অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মতো উত্তর -দক্ষিণে লম্বা প্রায় ১৪০ কিমি. পূর্ব-পশ্চিমে একটু কম। ভূ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ঝাড়গ্রাম সহ মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা শক্ত পাথুরে ল্যাটেরাইট প্রকৃতির যা চাষবাষের উপযোগী নয়। আবার ঘাটাল, খড়্গপুর, তমলুক, কাঁথি, এগরা মহকুমার মাটি চাষাবাষের উপযুক্ত।

এই জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নদী-নালার সংখ্যা একটু বেশী। হুগলি নদী এই জেলায় প্রবেশ না করলেও তার শাখানদী জেলার ভরণপোষণে সাহায্য করেছে। হুগলীর অন্যতম উপনদী রূপনারায়ণ মেদিনীপুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, রূপনারায়ণের প্রধান উপনদী শিলাবতী ছাড়াও এই জেলাতে কাঁসাই, কেলেঘাই, সুবর্ণরেখা, হলদি, রসলপুর, তারাফেনী, ডুলুং, পারাং, তমাল, কুবাই প্রভৃতি নদী রয়েছে। নদনদী ছাড়াও অনেক খাল এই

জেলার শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সহযোগিতা করছে অকুণ্ঠভাবে।[২] সুতরাং উপযুক্ত ভৌগোলিক পরিবেশ, উর্বর ভূমি ও একাধিক নদ-নদীর উপস্থিতি এই জেলাকে কৃষি সমৃদ্ধ জেলা হিসাবে গড়ে তুলেছে। কৃষি কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

এছাড়াও জেলার সর্বত্র কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ পরিবহনের জন্য ব্রিটিশ সরকার এই জেলাতে একাধিক ক্যানেল নির্মাণ করেছিল। ১৮৬৪ সালের ক্যানেল আইনে (The Canals Act, 1864) লেফটেনেন্ট গভর্ণরের অধীনে বাংলা প্রদেশে ক্যালেন থেকে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্ধারণ করা, ক্যানেল, খাল ও নালা নির্মাণ--- উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়।[৩] এই আইনের ভিত্তিতেই বাংলার অন্যান্য জেলার মতো মেদিনীপুর জেলাতে ক্যানেল, খাল ও নালার খনন কার্য শুরু হয়।

মেদিনীপুর জেলার প্রধান ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ক্যানেল হল--- ১) মেদিনীপুর ক্যানেল, ২) হিজলী-টাইডাল ক্যানেল ও ৩) ওড়িশা উপকূলের ক্যানেল। উক্ত ক্যানেলগুলির মধ্যে মেদিনীপুর ক্যানেল নির্মিত হয়েছিল জলসেচ ও পরিবহন-এর উদ্দেশ্যে, আর বাকী দুটি ক্যানেল শুধুমাত্র নৌপরিবহনের উদ্দেশ্যে খনন করা হয়েছিল।[৪] উক্ত ক্যানেলগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নেওয়া যাক প্রথমে---

মেদিনীপুর ক্যানেল: ১৮৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া ইরিগ্রেশন অ্যান্ড ক্যানেল কোম্পানী মেদিনীপুর ক্যানেলের খননকার্য শুরু করেছিল। কিন্তু ২ বছর পর সরকার এই ক্যানেলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিয়ে নেয়। প্রসঙ্গত এই ক্যানেলটি ওড়িশা ক্যানেলের অন্তর্ভূক্ত পরিকল্পনা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ জলপথের মাধ্যমে বানিজ্যিক পণ্য পরিবহনের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কটক থেকে কলিকাতা পর্যন্ত নৌ-পরিবহনের পথ তৈরি করা। যদিও খুবই প্রাথমিক পর্বে এই ক্যানেলটি একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প হিসাবে গৃহীত হয়। মেদিনীপুর পর্যন্ত কাঁসাই নদীর জল পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয় এই ক্যানেলের মধ্যে যে, এখানে জলস্তর নিয়ন্ত্রণের প্রধান কেন্দ্র নির্মিত হয়। ক্যানেলটি উলুবেড়িয়া পেরিয়ে হুগলি নদী পর্যন্ত প্রসারিত রূপনারায়ণ ও দামোদর নদী পেরিয়ে।

প্রধান মেদিনীপুর ক্যানেলটি ৪টি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের কেন্দ্র মেদিনীপুর যেখানে জল পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যার বিস্তৃতি পাঁশকুড়া পর্যন্ত। দৈর্ঘ্য ২৫ মাইল। দ্বিতীয় বিভাগটি পাঁশকুড়া থেকে দেনান হয়ে রূপনারায়ণ পর্যন্ত, ১২ মাইল এখানেও একটি লকগেট যুক্ত জলস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য। তৃতীয় বিভাগটি রূপনারায়ণ থেকে কাঁটাপুকুর হয়ে, কাটাপাড়া পেরিয়ে দামোদর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্থ বিভাগটি দামেদর থেকে হুগলী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্যানেলের সামগ্রিক দৈর্ঘ ৫৩ মাইল। ১৮৬৮ সালে ক্যানেলটি নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত খরচ হিসাবে ৮.৫ মিলিয়ন ধার্য কার হয়েছিল। এবং নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৮৮-৮৯ সালে খরচ হয়েছিল ৮.৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৫১ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছিল ৮.৪৯ মিলিয়ন টাকা।[৫]

হিজলী টাইডাল ক্যানেল: হিজলী টাইডাল ক্যানেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৮৬৮ সালে এবং সম্পূর্ণ হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৪৮ সালে ওড়িষার বালেশ্বর বিভাগের এক্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার Mr.Vertanesnএর রিপোর্ট থেকে এই ক্যানেল-এর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এই ক্যানেলের দুটি ভাগ ছিল--- একটি গেঁওখালির থেকে শুরু করে পড়েছে ইটামগরার কাছে হলদী নদীর বাম তীরে। দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। দ্বিতীয় ভাগটি হলদী নদীর দক্ষিণ তীরের ভাইটগড়ের কাছ থেকে সোজা এগিয়ে মিশেছে কালিনগরের কাছে রসুলপুর নদীতে দৈর্ঘ্য ১৭ মাইল।[৬]এই ক্যানেলে ৪টি লকগেট নির্মিত হয়েছিল যথা, গেঁওখালি, ইটামগড়া, তেরপেখিয়া এবং কালিনগরে। এই ক্যানেলটি মূলত নির্মিত হয়েছিল নৌ-চলাচলের উদ্দেশ্যে। দৈর্ঘ্য ৪৯ ৫/৪ মাইল। নির্মাণ শুরু থেকে ১৯৫১ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত খচর হয়েছিল ২.৬১ মিলিয়ন টাকা।[৭]

Mr.Vertanesnএর বিবরণ থেকে জনা যায় যে, দুটি ভাগে বিভক্ত এই ক্যানেলের প্রথম ভাগ পূর্বের বাঁকা নালা নামে খাঁড়ির সামনে-পিছনে কিছুটা নতুন ভাগে যোগ করে গড়ে উঠেছে। কোম্পানীর লবন বিভাগের দায়িত্ব ছিল বাঁকানালার রক্ষণাবেক্ষণের, কাঁথির হিজলীর লবন অফিসের সরকারি লবন এই বাঁকা নালার মাধ্যমে কলকাতায় পৌঁছাত। এরপর কোম্পানীর লবন ব্যবসা উঠে গেলে, ইস্ট ইন্ডিয়া ইরিগ্রেসন অ্যান্ড ক্যানেল কোম্পানী এই নালাকে নৌ চলাচলের উপযোগী করার জন্য গেঁওখালির কাছে ১,৪১,০০০ টাকা খরচ করে লকগেট তৈরী করা হয়। নতুন লকগেট করার পক্ষে বাঁকা নালার মাটি ভালো নয় বলে মনে করেন মাটি বিশেষজ্ঞরা। জায়গাটি অপরিচিত, যাতা - যাতবিহীন এলাকা, ফলে নরম মাটি এবং চোরাগুপ্তা থাকায় সরিয়ে আনা হয়। এর জন্য বাঁকা

নালার উত্তর বিন্দুর ৪ মাইল দূর থেকে নতুন খাল কেটে আনা হয় গেঁওখালির বাজারের কাছে। তবে দ্বিতীয়-অংশের ক্যানেলটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে কাটা হয়েছে তমলুক-কাঁথি রাস্তার মাইল চার দূরে সমুদ্রের দিকে। কাজ সম্পূর্ণ হলে অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৭৩ সালে ক্যানেলটি নৌ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।[৮]

ক্যানেলটির জলের গভীরতা ৮-১০ ফুট আর বর্ষায় ১৬.৫ ফুট। হান্টারের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, জলের গভীরতা ৮ ফুট থাকলেও তলদেশের চওড়া ২৬ ফুট, উপরিভাগের চওড়া ৭২ ফুট। ক্যানেলের দ্বিতীয় অংশের তলদেশের চওড়া ৬৪ ফুট এবং উপরিভাগের ৯২ ফুট। ক্যানেলটির প্রথম ভাগে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ৫ টি স্লুইস বসানো হয়েছিল জমিদার ও তারপ্রজাদের বিনা পয়সায় জল সরবরাহের জন্য। কারণ তারা বহুপূর্ব থেকেই চাষের জন্য জল পেয়ে আসছিল।

ওড়িশা উপকূলীয় ক্যালেন: বাংলার সাথে ওড়িশার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য হিজলী টাইডাল ক্যানেলের দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে আরো একটি ক্যানেলের সংযোগ ঘটানো হয় যা ওড়িশা উপকূলীয় ক্যালেন নামে পরিচিত। এই ক্যানেলটির দৈর্ঘ্য ৫৪.৫ মাইল। ক্যানেলটি শুরু হয়েছে রসুলপুর নদীর ডান তীরে বাইতগড় থেকে, যেখানে হিজলী ক্যানের সাথে যুক্ত। চলে গেছে সোজা বালেশ্বর পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাকাই নদী পর্যন্ত। যে অংশটি হিজলী ক্যানেলের সাথে যুক্ত, যা নৌ চলাচলের জন্য নির্মিত তাতে জল সরবরাহ করা হয় রসুলপুর নদী থেকে সূবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত। ১৮৮০ সালে এই ক্যানেলটির কাজ শুরু হয় এবং নৌ চলাচলের জন্য ১৮৮৬ সালে ক্যানেলটি খুলে দেওয়া হয়েছিল।[৯]

জলসেচ: উক্ত তিনটি ক্যানেলের মধ্যে মেদিনীপুর ক্যানেলের প্রথম দুটি বিভাগ জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। মেদিনীপুর ক্যানেল কাঁসাই, রূপনারায়ণ, দামোদর ও হুগলী নদীকে যুক্ত করেছিল। এর মধ্যে কাঁসাই ও রূপনারায়ণ নদীর জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়েচিল। ১৯৭১ সাল থেকে এই ক্যানেলের মাধ্যমে জলসেচ শুরু হয়েছিল। ১৮৭১-৭২ সালে ৬০২০ একর, ১৮৭২-৭৩ সালে ১৪১৩০ একর ও ১৮৭৩-৭৪ সালে ৩৬৩৪৯ একর জমি সেচের সুবিধা পেয়েছিল। এর ফলে কৃষি কাজের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। এর ফলে যে পরিমান চাষের জমি বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা উৎপাদনকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে ১০,০০০ টন খাদ্য শষ্য উৎবৃত্ত অংশ হিসাবে রপ্তানি হয়েছিল।[১০]

মেদিনীপুর ক্যানেলের প্রথম অংশে অর্থা মেদিনীপুর থেকে পাঁশকুড়া পর্যন্ত অঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থা করা হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৭-৮ বছরের চুক্তির মাধ্যমে১৮৭৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত রেট ছিল একর প্রতি ১.৮ টাকা। পরবর্তী সময়ে বর্ধিত হয়ে হয় একর প্রতি ২ টাকা।[১১] ১৯২৫-২৬ সাল পর্যন্ত (রবি+খারিফ) শষ্যের সেচের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৮০-৮১ সালে ১০৩৪৬২ একর জমি জলসেচের সুবিধা পেয়েছিল যার মধ্যে পুরোটাই ছিল খারিফ শস্য। ১৮৯০-৯১ সালে ৮২০০২ একর, ১৯০১-০২ সালে ৮২১৩৪ একর ১৯১০-১১ সালে ৭৩৯৪০ একর, ১৯২০-২১ সালে ৯১০৬৬ একর এবং ১৯২৫-২৬ সালে ৫৬৯৮ একর জমি জলসেচের সুবিধা লাভ করেছিল।[১২] ১৯১১ সালে পাঁশকুড়া ও মেদিনীপুর শাখার চাষযোগ্য জমির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯০০০ একর ও ৭১০০০ একর।[১৩] উক্ত দুই শাখার জল নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি অ্যানিকেট নির্মিত হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারদ্বয় ছিলেন পামার ও কিমার।[১৪]

১৯৩৯-৪০ সালে এই জেলাতে জলসেচের পরিমান হল ১৯৩৮-৩৯ সালে ৫৩৪১২ একর এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৬৪৮৮২ একর জমি জলসেচ হয়েছিল।এর মধ্যে মেদিনীপুর শাখায় ৫৪৫৬৩ একর ও পাঁশকুড়া শাখায় ৬৩১৯ একর জমি ছিল।[১৫] ১৯৫১ সালে জেলায় চাষযোগ্য জমির পরিমান ছিল ২১৩৪২০০ একর, এর মধ্যে জলসেচের মাধ্যমে চাষ হয়েছিল ৪৩৪৩১০ একর জমি[১৬]। মেদিনীপুর ক্যানেলের অধীন বেশ কিছু শাখা খাল ছিল কাঞ্চুদিয়া-৪১৭ একর, নারায়নগড়- ২৮৫০০ একর, কাঞ্চনটোলা- ৭৭৫ একর। মুকসুদপুর ২৫৫২ একর, বুরুমুলা- ৭৯২ একর, কন্টাই ময়নাচোকু, বালিচক, জয়কৃষ্টপুর আরঙ্গবাদ, গয়লাগেরিয়া, সুরাল, বারমাহাদপুর ইত্যাদি উক্ত শাখাগুলির মাধ্যমে জেলার বিশাল এলাকা জুড়ে জলসেচের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।[১৭]

হিজলী টাইডাল ক্যানেলের উন্নতি সাধনের জন্য বালেশ্বর ডিভিশনের তৎকালীন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আপজন সাহেব এক প্রকল্প তৈরী করেছিলেন। যার থেকে জানা যায় যে এই ক্যানেল থেকে বিগত ১৪ বছরের

বার্ষিক গড় আয় ছিল ৪৫০০০ টাকা।[১৮] এই ক্যানেলের মাধ্যমে জেলার দক্ষিণ পূর্ব অংশে প্রধানত জল সরবরাহ করা হত। ১৯০৮-০৯ সালে ৬৩৮২৪ একর, ১৯০৯-১০ সালে ৭০৪৩৮ একর, ১৯০১০-১১সালে ৭৩৯০০ একর, ১৯১১-১২ সালে ৭৯৯৯২২ একর এবং ১৯১২-১৩ সালে ৮০৫৮৫ একর জমিতে সেচের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।[১৯] উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে এই জলসেচ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বেড়েছিল। আর ওড়িশা উপকূলীয় ক্যানেল শুধুমাত্র নৌ-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

নৌ-পরিবহন: উক্ত ক্যানেলগুলি পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। হিজলি টাইডাল ক্যানেল থেকে কত পরিমান রাজস্ব পাওয়া যাবে তার হিসাব দিতে গিয়ে Mr. Vertarnesn বলেছেন যে, এলাকার মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বা একর প্রতি ৬ মন ধান কলকাতায় পাঠানো যাবে। এলাকার মোট রপ্তানির ৮ ভাগের ৫ ভাগ বহন করতে পারবে এই ক্যানেল। পুরো ক্যানেল এর মাধ্যমে ৫০,০০০ টন ধান পাঠানো যাবে। আর এই কাজে আয় হবে ৫০ হাজার টাকার মতো। ১৬ হাজার খরচ বাদে নিট রাজস্ব আসবে ৩৪ হাজার টাকার মতো। মেদিনীপুর ক্যানেলের রাজস্ব থেকে তার পরিবহন ব্যবস্থায় ভূমিকার কথা জানা যায়। যদিও প্রথম দিকে ১৮ ৭১-৭৯ সাল পর্যন্ত আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। কিন্তু ১৮৭৯-৮০ সালে নিট রাজস্ব ৮৫২০০ টাকা আদায় হয়েছিল। ১৮৯৩-৯৪ সালে সর্বোচ্চ নিট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯৬৫৭৯ টাকা। ১৯০২-০৩ সালে নিট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৭১২২৬ টাকা। কিন্তু বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৩ সালে খড়্গপুর একটি রেল জংশন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে নৌ-পরিবহনের শুল্ক অর্ধেক করে দেওয়া হয়, যাতে নৌ পরিবহনে উৎসাহ প্রদান করা যায়।[২০] ১৯১৭-১৮ সালে নিট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯১৬৫৪ টাকা। পরের বছরই নিট রাজস্ব কমে দাঁড়ায় ৬১১৯৮ টাকা। ১৯২৫-২৬ সালে নৌ-পরিবহন থেকে আদায় হয়েছিল--- মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ৬০৩২০ টাকা, হিজলী টাইডাল ক্যানেল থেকে ১০৪৪৫০ টাকা ও ওড়িশা উপকূলীয় ক্যানেল থেকে ৩৭৪৩৩ টাকা।[২১]

১৯২৫-২৬ সাল মেদিনীপুর ক্যানেলের মাধ্যমে চাল ৪০৫৭ টন, হিজলী টাইডাল ক্যানেলের মাধ্যমে চাল ১০৯ টন পরিবহন হয়েছিল।[২২] ১৯৩৩-৩৪ সালে নৌ-পরিবহনের মাধ্যমে মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে আদায় হয়েছিল ৪৬,১৯৮১১ টাকা।[২৩] ১৯৩৫-৩৬ সালে মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ৬১৭২৪ টাকা, হিজলী ক্যানেল থেকে ৬৩৯০০ টাকা আদায় হয়েছিল। ১৯৩৩-৪০ সাল মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ১,০৩৩,৯৯৯ টাকা, হিজলী ক্যানেল থেকে ৩৫৭৫৫১২ টাকা, ও ওড়িশা ক্যানেল থেকে ২৭০৮৯০৭ টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বাহিত হয়েছিল। ফলে উক্ত বর্ষে মেদিনীপুর ক্যানেল থেকে ১০৪০৫ টাকা, হিজলী ক্যানেল থেকে ৫৩০৮৭ টাকা, ওড়িয়া ক্যানেল থেকে ২৭০২২ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল।[২৪]

উপনিবেশিক সরকার বাংলার কৃষিক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা গ্রহণ করলেও উনিশ শতক থেকে বাংলার বৈপ্লবকি পরিবর্তন ঘটে নি। এযুগে চাষের জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছিল ঠিকই তবে তা প্রয়োজনীয় সমস্ত জলের সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব ছিল না। এ যুগে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জলসেচ ব্যবস্থার প্রচলন হয়নি। হান্টার সাহেব বর্ধমান জেলার জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন: বর্ধমান জেলায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জলসেচ ব্যবস্থা প্রায় অজানা বললেই চলে যদিও পুকুর, খাল বা স্বাভাবিক জলাশয়গুলিকে বৃষ্টির জলের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ প্রচলিত প্রথা হল ছোট ছোট নদীতে বাঁদ দিয়ে পাশের জমিতে সেচ দেওয়া। এক বিঘা ধানজমির সেচের খরচ এক টাকা আর আখের জমির পাঁচ টাকা।[২৫]

উনিশ শতক বাংলার ৭৫ শতাংশ কৃষক সরকারি জলসেচ ব্যবস্থা কৃষকদের নিয়মিত সাহায্য করতে পারত না, শুধু খরার সময় কৃষকরা এখান থেকে জল নিত। আবার ক্যানেল কর দিয়ে চাষ করা কৃষকদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হত। এমন কী জমিদাররা খাজনা বাকি পড়ার ভয়ে জলসেচের সম্প্রসারণে বাধা দিতেন। সরকারি ক্যানেলের জল ব্যবহার না করার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হত। জর্জ ব্লিনের মতে, ১৮৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে ধান চাষের অবনতির উল্লেখ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এজন্য রেলপথ নির্মাণ ও জলসেচ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।[২৬]

১৯৩০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির হিসাব থেকে জানা যায় যে, বাংলার মাত্র ১০১১৩৮ একর জমিতে সরকারি সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। বাংলার মোট কৃষি জমির ৭ শতাংশ জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছিল।

অথচ ঐ সময় পাঞ্জাব ৫৬, যুক্তপ্রদেশে ২৯, মাদ্রাজে ২৭, বিহার ও উড়িষ্যায়-২১, বোম্বাই-এ ১৩, আসামে ১০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। নিঃসন্দেহে জলসেচ ব্যবস্থায় বাংলা পিছিয়ে ছিল।[২৭]

১৯১১-১৭ সাল এ.কে. জেমসন সাহেবের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, চাষযোগ্য মোট জমির পরিমান হল ২০৪১৫৫০ একর। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইসাক সাহেবের রিপোর্ট থেকে মোট চাষযোগ্য জমি ২০০১৭৮৮.১৩ একর ও ১৯৫১-৫২ বর্ষে ২৫৫১৬০০ একর চাষযোগ্য জমির কথা জানা যায়।[২৮] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিশ শতকের প্রথম থেকেই মেদিনীপুর জেলাতে চাষযোগ্য জমির পরিমান ক্রমাগত বেড়েছে। সে ভাবে জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটে নি। তা স্বত্ত্বেও সবশেষে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক সরকার এই জেলাতে কৃষি সম্প্রদায় ও নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে যে ৩টি ক্যানেলের নির্মাণ করেছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই জেলার কৃষি ইতিহাসে। সীমিত অর্থে হলেও উক্ত ক্যানেলগুলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষির বিস্তার ঘটিয়েছিল এবং কৃষকদের মনে চাষের প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১। Census Report-1961, West Bengal District of the Midnapore, Alipore, West Bengal, Government Press, 1966, p. 104.
২। মুখোপাধ্যায়, অভিনন্দন, অবিভক্ত মেদিনীপুর: ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বর্তমানের বিশেষণ, নবারূণ, আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত, ১৪ এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ১২,১৪
৩। মান্না, সন্দীপ, ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলার ক্যানেল ব্যবস্থা: বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এক অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস অনুসন্ধান ৩৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ. ৩৯২
৪। Mitra A, Census 1951, West Bengal: District Handbooks, Midnapore, Alipore, West Bengal Government Press, 1953, P-Ixxxiii
৫। Mitra A, Ibid, p-Ixxxiii
৬। কুণ্ডু, কমলকুমার, হিজলি টাইডাল ক্যানেল, হরপ্রসাদ সাহু (সম্পা), মহিষাদর ইতিবৃত্ত, বাকপ্রতিমা, মহিষাদল, ২০১৬, পৃ. ৬০
৭। Mitra A, Ibid, p-Ixxxx
৮। Mitra A, Ibid, p-Ixxxx
৯। Mitra A, Ibid, p-Ixxxx
১০। মান্না, সন্দীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩
১১। O'Malley, Lss, engal District Gazetteers-Midnapore-1911. Calcutta. Government of West Bengal, p. 121
১২। The Annual Irrigation Revenue Report for the Year 1925-26, Irrigation Dept. Government of West Bengal, 1927, p. 4,6
১৩। O'Malley, ibid, p. 122
১৪। বসু যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনি, ১৪১৬ (বঙ্গাব্দ) পৃ. ৫১৩
১৫। Mitra A, ibid, p.Ixxxiv
১৬। Mitra A, ibid, p.168
১৭। মান্না সন্দীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩
১৮। কুণ্ডু কমল কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১৯। মান্না সন্দীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫
২০। O'Malley, ibid, p. 123

২১। 1925-26 Report, ibid, p-p
২২। Ibid, p. 12
২৩। Annual Irrigation Revenue Report year 1933-34, Govt. of Bengal, Irrigation Dept. p. 25
২৪। Mitra A, ibid, p. Ixxxiii-v
২৫। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, উনিশ শতক, কলকাতা, কে পি বাগজী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭, পৃ. ৪৩
২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
২৭। মুখোপাধ্যায় সুবোধকুমার, প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ. ৬,৭
২৮। বেরা রাজীব, মেদিনীপুর জেলার কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা (১৮৮৫-১৯৫১)-একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, মেদিনীপুর, কবিতিকা, ২০২৩, পৃ. ২৮, ২৯